আমাদের সংস্কৃতি ঃ স্বরূপ ও সংকট-- উত্তরণের বিকল্প সন্ধানে।

মোঃ জানে আলম*

সাধারণ লোকের--বিশেষভাবে আমাদের সমাজের-- চিরাচরিত ধারণা হলো--নৃত্য সংগীত ললিতকলা ইত্যাদিই হল সংস্কৃতি, আর এসবের চর্চাই হল সংস্কৃতি চর্চা। অথচ সংস্কৃতি শব্দটির অর্থ অনেক ব্যাপক ও গভীর। বস্তুতঃ একজন ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনাচরণ ও তৎজাত চিন্তা চেতনা মূল্যবোধ, অর্থাৎ তার সামগ্রিক মানসিক পরিমণ্ডলই তার সংস্কৃতি। কোন ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর চিন্তা, চেতনা ও মূল্যবোধ গড়ে উঠে যে সামাজিক পরিবেশে সে জন্ম লাভ করে, বেড়ে উঠে ও জীবনযাপন করে, তার উপর ভিত্তি করে, অর্থাৎ তার সামাজিক পরিবেশেই তার মানসিক ভাবজগতের উৎসভূমি। সামাজিক পরিবেশ আবার চুড়ান্ত বিচারে নির্ভর করে সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। বস্তুতঃ এটাই যেকোন সমাজের ভিত্তি, রাজনৈতিক-অর্থনীতির পরিভাষায় অবকাঠামো (Infrastructure)। আরো সহজভাবে বললে মানুষের জীবিকা নির্বাহের উপায়ই (রাজনৈতিক অর্থনীতির পরিভাষায় উৎপাদন সম্পর্ক) তার চিন্তা-চেতনার মূল নির্ধারক। বাঙ্গালী জাতির নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস থেকে আমরা জানি, আর্য, দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক জাতির সংমিশ্রণে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-গঙ্গার অববাহিকায় গড়ে উঠা ব-দ্বীপ অঞ্চলে যে সংকর জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ও বিকাশ, হাজর বছরের বিকাশ-বিবর্তনের পথ পরিক্রমায় সে জনগোষ্ঠীই হল আজকের বাঙ্গালী। একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে--নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী বাঙ্গালীর সংস্কৃতির বিকাশে প্রাথমিকভাবে ধর্মের কোন ভূমিকাই ছিলনা। বাঙ্গালীর স্বকীয় জীবিকা নির্বাহ পদ্ধতি, বিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে ওঠা তার একক ভাষা--বাংলা, সমবৈশিষ্ট সম্পন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ, একটি আলাদা সংস্কৃতির জন্ম দেয়। বলা বাহুল্য, সেটাই বাঙ্গালীর আবহমান কালের লোকজ সংস্কৃতি। যেহেতু যে কোন জাতি বা জাতি গোষ্ঠীর সংস্কৃতি মৌলিকভাবে নির্ভর করে সে জাতি বা জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহের উপায়, তথা তার অর্থনৈতিক জীবনধারার উপর এবং যেহেতু সমাজের উৎপাদিকা শক্তির ক্রমবিকাশের ফলে জাতি বা জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহের প্রথা বা পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে, সেহেতু তার সংস্কৃতি ও নিয়ত পরিবর্তনশীল। সংস্কৃতির এ নিয়ত পরিবর্তনে বাহ্যিক ও পারিপার্শ্বিক কিছু উপাদানও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে; যেমন শিক্ষা,ধর্ম, রাজনীতি, বিজ্ঞান, পারিপার্শ্বিক দেশাচার তথা বিদেশী সংস্কৃতি ইত্যাদি। তবে ধর্মের ও বিজ্ঞানের প্রভাবটা এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য। ইসলামী ধর্মীয় আচার-আচরণের সাথে আবহমান কালের বাঙ্গালী সংস্কৃতির মিথষ্ক্রিয়ায় বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে নোতুন একটি সাংস্কৃতিক উপধারা সৃষ্টি হয়েছে--একটি মুসলিম-বাঙালি পরিবার ও হিন্দু-বাঙালি পরিবারের প্রাত্যহিক জীবনাচরণের মধ্যে যা প্রতিভাত--তা বাঙ্গালী সংস্কৃতিকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি। বস্তুতঃ আমাদের আত্ন-পরিচয় নিয়ে বিতর্কের সূচনা এখানেই। আবার আধুনিক শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রভাবে বাঙ্গালীর লোকজ সংস্কৃতিও ক্রম পরিবর্তনের ধারায় এগিয়েছে অনেক দূর।

আমাদের সাংস্কৃতিক সংকটের স্বরূপ

আমাদের সাংস্কৃতিক সংকটকে আমরা নিন্মোক্ত সুনির্দিষ্ট ভাগে চিহ্নিত করে আলোচনা করতে পারি। যেমন--

এক, আমাদের আত্নপরিচয়ের সংকট, অর্থাৎ আমাদের জাতীয়তা নিয়ে বিতর্ক;

দুই, বৈদেশিক সংস্কৃতির সাথে আমাদের লোকজ সংস্কৃতির নিরন্তর দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সমন্বয়;

তিন, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে আমাদের নিন্মোক্ত পশ্চাৎপদতা-

ক) অশিক্ষা-কুশিক্ষা খ) ধর্মান্ধ চিন্তা-চেতনা, কুসংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতা গ) চরম দারিদ্র্য।

আত্ন-পরিচয়ের সংকট

আমাদের আত্ন-পরিচয়ের সংকটের পটভূমি ঐতিহাসিক। আমরা শুরুতেই উল্লেখ করেছি, বস্তুতঃ নৃ-তাত্ত্বিকভাবে আর্য-দ্রাবিড়-অষ্ট্রিক জাতির সংমিশ্রনে গড়ে উঠা একটি সংকর জনগোষ্ঠী বিবর্তিত হয়ে জন্ম হয়েছিল বাঙালি জাতির। কিন্তু বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের চুড়ান্ত পর্যায়ে এসে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলিম জাতি হিসেবে আমরা পাকিস্তানের নাগরিকত্ব লাভ করি। অথচ পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পর বিতর্ক উঠল আমরা বাঙ্গালী না মুসলমান। ইসলামী তাহজীব তমুদ্দুন কি আমাদের সংস্কৃতি হবে, নাকি আবহমান কালের বিবর্তনশীল লোকজ দেশাচার হবে আমাদের সংস্কৃতি। ধর্মীয় ভাবাদর্শের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা পাকিস্তানের পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী যখন ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে বাঙ্গালী মুসলমানদের উপর শোষণ চালাল, তখন এতদাঞ্চলের বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ন-তাত্ত্বিক জাতীয়বাদী চেতনার উম্মেষ ঘটতে লাগল। বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী তখন হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করল, পশ্চিমা ভিন্ন ভাষী মুসলমান ভাইয়েরা তাদেরকে একই ধর্মের মুসলমান ভাইয়ের পরিবর্তে ভিন্ন ভাষী ভিন্ জাতি হিসাবেই বেশী বিবেচনা করছে।

বস্তুতঃ ধর্মীয় জাতীয়তার ব্যাপারে তখনই তাদের মোহ ভঙ্গ হতে শুরু করে। তারা নোতুন করে উপলব্ধি করে ধর্মীয় বিশ্বাসের চেয়ে ভাষা-সংস্কৃতি মানুষকে বেশী আপন করে। তখন পশ্চিমা মুসলমান ভাইদের রাজনৈতিক শাসন ও অর্থনৈতিক শোষনের বিরুদ্ধে বাঙ্গালী ঐক্যবদ্ধ হলো––জাগো জাগো, বাঙ্গালী জাগো শ্লোগান তুলে। তোমার আমার ঠিকানা––পদ্মা, মেঘনা, যমুনা। তুমি কে, আমি কে, বাঙ্গালী বাঙ্গালী প্রভৃতি শ্লোগানে উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালী জেগে উঠল প্রবল জাতীয়তাবাদী চেতনা নিয়ে। বলা বাহুল্য, মুষ্ঠিমেয় বাঙ্গালী ছাড়া পুরো জাতি এচেতনায় শুধু উজ্জীবিত ছিলনা, বিক্ষোভে বিদ্রোহে ছিল উদ্বেলিত। এ চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়েই বাঙ্গালী নয়মাসের সশস্ত্র যুদ্ধে পাকিস্তানীদের পরাস্ত করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনল। এবার তাদের পুনঃজন্ম হলো বাঙ্গালী জাতি হিসেবে। সঙ্গতঃ কারনেই বাংলাদেশ হলো বাঙ্গালী জাতি রাষ্ট্র। পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড়, রাঢ়, সুক্ষ,বরেন্দ্রী, হরিকেল, সমতট, বঙ্গ––প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড জনপদের রাজনৈতিক রূপান্তর হোয়ে জন্ম হলো একটি রাজনৈতিক জনপদ––আজকের বাঙলাদেশ। এভাবেই স্বাধীনতা-পূর্বকালের বাঙ্গালীর আত্ন-পরিচয়ের সংকটের নিরসন ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশর উভ্যুদয়ের মধ্যদিয়ে।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সে বিতর্কের পুনরুত্থান ঘটল, কিন্তু কেন?

দু'দশকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, অতঃপর নয় মাসের রক্তাক্ত স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালীর যে নোতুন আত্নপরিচয়ের উম্মেষ ঘটে তার অন্তর্নিহিত প্রেরণা ছিল একটি আত্নমর্যাদা সম্পন্ন স্বাধীন জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার আকাঙ্খা, যার অনিবার্য পূর্বশর্ত হলো অর্থনৈতিক মুক্তি। যে সমাজতাত্ত্বিক সত্যটি এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে তাহলো মানুষের সামাজিক সত্তাই সামাজিক চেতনার নির্ধারক। তাই মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে গড়ে উঠা মূল্যবোধগুলো জাতীয় মানসে দৃঢ়মূল করার অনিবার্য পূর্বশর্ত ছিল সদ্য স্বাধীন দেশে এমন একটি সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা, যে পরিবেশে পরম স্বস্তিতে বাস করে মানুষ বুক ভরে শ্বাস টেনে বুঝবে সে স্বাধীন দেশের নাগরিক। সেক্ষেত্রে কিছু যুদ্ধোত্তর প্রতিবন্ধকতা সত্বেও আমাদের নেতৃত্বের সীমাহীন ব্যর্থতা জাতিকে হতাশার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে। জনমনে প্রশ্ন জাগে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র তাদের যে কাঙ্খিত মুক্তি দিতে ব্যর্থ হলো, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্রও কি সেভাবে ব্যর্থ হবে? এ সন্দেহ-অনিশ্চয়তা স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা বাঙ্গালীর জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরাল। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে কাঙ্খিত সমাজ বিনির্মাণে আমাদের এ চরম ব্যর্থতা বাঙ্গালী জাতির অভূতপূর্ব ঐক্য ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য কার্যকর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তকে সফল হতে দারুনভাবে সহায়তা করেছিল। এ ছিল স্বাধীন দেশে আবারো বাঙালির আত্ম-পরিচয় নিয়ে সৃষ্ট বিতর্কের আত্ম-সামাজিক প্রেক্ষিত। কিন্তু এর রাজনৈতিক প্রেক্ষিতটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর হতে দেশের শাসকগোষ্ঠী––সামরিক–বেসামরিক নির্বিশেষে––ধর্মকে রাজনীতিতে এমন মাত্রায় ব্যবহার করেছেন––নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে––যার ফলে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি আমজনগণের কাছে অনেকটা বৈধতা পেয়ে যায়, যা তারা একাত্তুরে প্রত্যাখান করেছিল। স্বাধীনতার পর হতে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত আমাদের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা অন্যতম রাষ্ট্রীয় নীতিমালা হিসাবে বহাল ছিল–ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ ছিল এবং ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার সুযোগ অবারিত ছিলনা। কিন্তু ১৯৭৫ সালের আগষ্ট মাসে এক ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতাচ্যুত করে যারা ক্ষমতাসীন হলো তারা সর্বাগ্রে তাদের এ অপকর্মের বৈধতা দিতে জনগণের সামনে আবির্ভূত হলো ধর্মের আলখাল্লা পড়ে। এতবড় একটা জঘন্য হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে মাথায় কালোটুপি ও মুখে আল্লাহ-রসুলের নাম নিয়ে মঞ্চে আবির্ভূত হলো খুনী মোস্তাক– প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিভূ হিসাবে–ক্ষমতাসীন হয়েই যে তার পরিহিত কালো টুপিকে জাতীয় টুপি ঘোষণা করেছিল। এ প্রতিবিপ্লবের সুবিধাভোগী হিসাবে ক্ষমতাসীন সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান দেশের সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র মুছে দিলেন। নৃতাত্ত্বিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্থলে নিয়ে আসলেন বাঙলাদেশী জাতীয়তাবাদ। অর্থনৈতিক নীতিমালার ক্ষেত্রে অধনবাদী বিকাশের পথ– যা সমকালীন উন্নয়নশীল দেশগুলেতে সঠিক উন্নয়ন কৌশল হিসাবে খুবই জনপ্রিয় ছিল– পরিহার করে ধনবাদী বিকাশের পথ গ্রহণ করলেন। বঙ্গবন্ধুর সাধারণ ক্ষমার পরও সুনির্দিষ্ট অভিযোগে একাত্তুরের যে সকল যুদ্ধাপরাধী বিচারের অপেক্ষায় ছিল তাদেরও ক্ষমা করে দেওয়া হলো। জামাতে ইসলামী সহ ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোকে ধর্মের নামে রাজনীতি করার লাইসেন্স ফিরিয়ে দিলেন। জামাতের আমীর যুদ্ধাপরাধী গোলাম আজমকে দেশে এনে রাজনীতিতে পূনর্বাসিত করলেন। কতিপয় মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশ–বিশেষভাবে সৌদী আরবের আর্থিক সাহায্য নিয়ে জামায়াতে ইসলামী তাদের রাজনৈতিক প্রচারণা তীব্রতর করল– যার মূল লক্ষ্য ছিলো বাঙলাদেশের স্বাধীনতাকে ভুল প্রমাণ করা এবং বাঙলাদেশকে তথাকথিত ইসলামী প্রজাতন্ত্রে রূপান্তর করা। পচাঁত্তরের পট পরিবর্তনের পর ধারাবাহিকভাবে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী নিজেদের রাজনৈতিক বৈধতা আদায় ও আমজনগণের কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবার জন্য ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করা শুরু করল পূর্ণোদ্যমে। মেজর জিয়া তার সকল বক্তব্য শুরু করার আগে প্রকাশ্যে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" বলা শুরু করলেন। জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ডের পর ক্ষমতাসীন খলনায়ক, তুলনাহীন দুশ্চরিত্র, হোসেন মোঃ এরশাদ রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের মাত্রাটা আরো বাড়িয়ে দিলেন একই লক্ষ্যে-- তার সব অপকর্মকে বৈধতা দেওয়া। তিনি সংবিধান সংশোধন করে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে দেশটাকে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে রূপান্তরের দিকে এক ধাপ এগিয়ে দিলেন । ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহারের

সাথে এরশাদ রাজনীতিতে পীরতন্ত্রের প্রবর্তন করে নোতুন মাত্রা যোগ করলেন । তিনি প্রকাশ্যে রাষ্ট্রীয় হেলিকপ্টার ব্যবহার করে বিভিন্ন পীরের কাছে যেতে শুরু করলেন এবং ঐসব গণ্ডমুর্খ ও ভণ্ড পীরদের উপদেশ প্রকাশ্যে সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রচার করতেন। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারকে এরশাদ এমন এক হাস্যকর পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যে, যখন তার বিরুদ্ধে গণআন্দোলন তীব্র হয়ে উঠল, তখন তিনি প্রতি শুক্রবারে কোন না কোন মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করতে যেতেন। মসজিদে গিয়ে তিনি পূর্বরাত্রে স্বপ্নাদিষ্ট হোয়ে সেই মসজিদে জুমার নামাজ পড়তে এসেছেন বলে ডাহা মিথ্যা অবলিলায় বলে যেতেন; অথচ মানুষ জানত, এরশাদ আসবেন বলে দু'তিন দিন পূর্ব থেকেই সরকারী লোকেরা ঐ মসজিদ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা ও নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত ছিল। এরশাদের পতনের পর প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী দল নির্বাচনী কৌশল হিসাবে নগ্নভাবে ধর্ম ও ভারত বিরোধীতাকে কাজে লাগাল। ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহারে তারা এতটুকু গেল যে, আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে ধর্ম চলে যাবে, মসজিদে মসজিদে আজানের পরিবর্তে উলু ধ্বনি হবে-- দেশ ভারতের অঙ্গ রাজ্যে পরিণত হবে- ইত্যাকার কথা জোরেশোরে বলে বেড়াতে লাগল । বলাবাহুল্য তারা এ অপকৌশলে সফল হয়ে নির্বাচনে জিতেছিল এবং ক্ষমতাসীন হোয়ে তারাও রাজনীতিতে-রাষ্ট্রীয় আচারানুষ্ঠানে- ধর্মের ব্যবহার বাড়িয়ে দিল। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বৃহৎ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ--সম্ভবতঃ ভোটের রাজনীতির বিবেচনায় এবং বিরোধী প্রচারণার জবাবে- তাদের রাজনৈতিক আচার আচরণেও ধার্মিকতা প্রদর্শণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলো। জয় বাঙলা শ্লোগানের সাথে তারা ও "লা-ইলাহা ইলালাহু-নৌকার মালিক তুই আলাহ"--প্রভৃতি শ্লোগান উচ্চারণ করতে লাগল। ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় বিভিন্ন উপনির্বাচনে বিএনপির সীমাহীন কারচুপি একটি দলীয় সরকারের অধীনে যে কোন নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলল। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানকে স্থায়ীরূপ দেওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ আন্দোলন শুরু করল। সে আন্দোলন করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ যুগপৎ কর্মসূচী গ্রহণ করল জামায়াতে ইসলামীর সাথে। আন্দোলনের মুখে প্রথমে বিএনপি একতরফা একটি নির্বাচন-অতঃপর সে নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন পাশ এবং সে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপি সরকারের সর্বাত্মক ব্যর্থতার পটভূমিতে আবারো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পটপরিবর্তন হলো। সুদীর্ঘদিন পর এবার ক্ষমতায় এলো মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ। কিন্তু বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে তত্ত্ববধায়ক সরকারের আন্দোলন করতে গিয়ে জামায়াতের সাথে অঘোষিত ঐক্য করে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির কী ক্ষতিটা আওয়ামী লীগ করেছে সে উপলব্ধি আওয়ামী নেতৃত্বের এখনো হয়েছে কিনা জানিনা। শুধু তা নয়, আওয়ামী লীগও তার রাজনৈতিক আচরণে এমন কিছু পরিবর্তন আনল যা প্রকারান্তরে ধর্মীয় রাজনীতিকেই উৎসাহিত করল। দীর্ঘদিন পর ক্ষমতাসীন হয়ে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পূনর্বাসনের তেমন কোন কার্যকর উদ্যোগত গ্রহণ করলই না, বরং তাদের দলীয় কর্মসূচী এবং রাষ্ট্রীয় কর্মসুচীতে তারা ধর্মীয় আচার-আচরণ অনুসরণ করতে শুরু করল পূর্ণোদ্যমে। সংসদে প্রত্যেক সাংসদদের মাথায় টুপি পরে বসা এবং যে কোন বক্তব্যের শুরুতেই জোর গলায় "বিসমিল্লাহীর রাহমানির রাহিম" বলা, কোন কিছুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে গিয়ে মোনাজাত করা, যে কোন অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলোয়াত করা, নেতা-নেত্রীর ফি বছর হজ্জ করা ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্মীয় আচরণের সাথে রাজনৈতিক আচরণকে গুলিয়ে ফেলে অপরাপর ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণের সাথে আওয়ামী লীগের আচরণের পার্থক্য নির্ণয় করা দুরূহ হয়ে পড়েছিল-যা বস্তুতঃ ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকেই বৈধতা প্রদান করছিল। পরিতাপের বিষয় হলো, ক্ষমতাসীন হয়ে বিএনপিতো নয়ই, আওয়ামী লীগও এরশাদ প্রণীত রাষ্ট্রধর্ম বাতিল করার কথা চিন্তাও করলনা। কিন্তু এত কিছু করেও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যেমন থাকতে পারলনা, তেমনি যে সকল ধর্মীয় গোষ্ঠীর মনজয় করার জন্য আওয়ামী লীগ এত ছাড় দিল -তাদের মন থেকেও আওয়ামী লীগ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা মুছে ফেলতে সক্ষম হলনা। বরং জাতীয়তাবাদী দল আরো এক ধাপ এগিয়ে জামাতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট নামক দলের সাথে জোট বেঁধে নির্বাচন করে আজ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়। ইতিহাসের নির্মম পরিহাস হলো-রাজনৈতিক স্বার্থে-ক্ষমতার লোভে- যে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মকে নিজেদের সুবিধামত রাজনীতিতে ব্যবহার করছে শেষ পর্যন্ত তারা কেউ ক্ষমতায় থাকতে পারবেনা বরং তাদের এ রাজনৈতিক আচরণ মৌলবাদীদের অবস্থানকে পাকাপোক্ত করে দিবে। ক্ষমতাসীন হয়ে জোট সরকার ধর্মপালনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের কাঁধে তুলে দিল। ক্ষমতান্ধ হয়ে এ সামান্য বোধটুকু আমাদের জাতীয়তাবাদী নেতারা হারিয়ে ফেলল যে, রাষ্ট্র একটি সামাজিক সংগঠন-কোন সংগঠনের কোন ধর্ম থাকেনা। ধর্ম, তথা উপসনা-ধর্ম (Worship Religion) থাকে মানুষের--কোন বস্তু বা সংগঠনের নয়। বস্তু বা সংগঠনের ইহকাল পরকাল নেই। তারা স্বর্গ-নরকে যাবেনা। তাই তাদের ধর্মের প্রয়োজনও নেই। কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্ম পালনের ফলে প্রকারান্তরে বৈধতা পেল ধর্ম নিয়ে রাজনীতি ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি। এভাবে সেক্যুলার রাজনীতির শেকড় কাটা হতে লাগল একে একে। বলাবাহুল্য, কেবল ক্ষুদ্র বাম গণতান্ত্রিক দলগুলো -জনমনে যাদের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ-ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির শ্লে-াগান অব্যাহত রাখল। কিন্তু তাদের কণ্ঠের আওয়াজ এতই ক্ষীণ যে তা আমজনগণ পর্যন্ত পৌছেনা। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, পাকিস্তানী রাজনীতিবিদরা যেভাবে ক্ষমতার স্বার্থে তিলে তিলে ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করে পাকিস্তানকে একটি ধর্মভিত্তিক সামরিক-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করেছেন, ঠিক সে পথেই আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা দেশকে নিয়ে যাচ্ছেন।

তফাৎ শুধু এই যে, আমাদের জনগণের প্রতিরোধের মুখে সামরিক আমলা এদেশে পাকিস্তানের মত শেকড় বিস্তারে সক্ষম হয়নি। (এতদ্বিষয়ে নিবন্ধকারের "মৌলবাদের জন্ম ও বিকাশ––রুখবো কিভাবে" শীর্ষক নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য)। উপরোক্ত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে চক্রান্তকারীরা আবারো জাতীয়তা নিয়ে বিতর্ককে সামনে নিয়ে আসল। এবার বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের বিপরীতে দাঁড় করানো হলো বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে। নোতুন বোতলে পুরানো মদ। সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক ব্যাপার হলো, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের পক্ষের শক্তির বিভক্তি এবং তাদের ক্ষমাহীন রাজনৈতিক ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধজাধারীরা ব্যাপক আমজনগোষ্ঠীকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হলো। অমীমাংসিত রয়েই গেল বাঙ্গালীর আত্ন-পরিচয়ের সংকট।

বৈদেশিক সংস্কৃতির সাথে আমাদের লোকজ সংস্কৃতির নিরন্তর দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সমন্বয়

বিদেশী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কথাটি ইদানীং খুব জোরেশোরে উচ্চারিত হচ্ছে। ডান-বাম উভয় মহল থেকেই এ সংলাপটি উচ্চারিত হলেও জাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু পরস্পর বিরোধী। নৃ-তাত্ত্বিক বাঙ্গালীর লোকজ যে সংস্কৃতি তাইকি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি, নাকি ইসলামী তাহজীব- তমুদ্দুন ভিত্তিক সংস্কৃতিই হবে বাঙ্গালী মুসলমানদের সংস্কৃতি, বিরোধটি এখানেই। বস্তুতঃ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ইসলামী ধর্মীয় আচার-আচরণের সাথে আবহমান কালের বাঙ্গালী সংস্কৃতির মিথষ্ক্রিয়ায় বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে নোতুন একটি সাংস্কৃতিক উপধারা সৃষ্টি হয়েছে যা বস্তুতঃ বাঙ্গালী সংস্কৃতিরই অর্ন্তগত। যারা বিদ্যমান এ ধারাকে অধিকতর ধর্মীয়করন করতে চান, তারা বস্তুতঃ নিজেদের বাঙ্গালী পরিচয়ে বিব্রতবোধ করেন––হীনমন্যতায় ভোগেন। পক্ষান্তরে ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে তাদের মধ্যে একটি অহংবোধ কাজ করে। (কারন তারা মনে করে তাদের ধর্মই একমাত্র সঠিক ধর্ম ও শ্রেষ্ট ধর্ম। অবশ্য দুনিয়ার কোন ধর্মই তার খাটিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী পরিহার করেনি।) মূলতঃ এ অহংবোধ থেকেই সাম্প্রদায়িকতার জন্ম।

আমরা শুরুতেই আলোচনা করেছি–– যে কোন সমাজের অর্থনীতি হল সে সমাজের ভিত্তি। তার উপর নির্ভর করে সে সমাজের সংস্কৃতি। সুতরাং সংস্কৃতি কোন স্থিতিশীল প্রপঞ্চ নয়, বরং নিয়ত পরিবর্তনশীল জীবনাচরণ। বিশেষ ভাবে একটি অগ্রসরমান জাতির সংস্কৃতি কখনো স্থবির হতে পারেনা। কথাটা উল্টোভাবেও সত্য। স্থবির সংস্কৃতির জাতি অর্থাৎ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আকঁড়ে থাকা জাতি কখনো এগিয়ে যেতে পারেনা। তাহলে আমাদের করণীয় কি? আমরা কি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নামে আমাদের সকল কুসংস্কার ও পশ্চাৎপদতা আকঁড়ে রাখব? (তাহলেতো শীতলপাটি, পিড়ে-মোড়া, গরুর গাড়ী ও মাটির পিদীমের যুগে আমাদের আবার ফিরে যেতে হয়। বেয়ারার কাঁধে-টানা পাল্কিতে আবারও নওশা সাজাতে হয়। বদ্ধ উম্মাদ ন্যাংটা ফকিরবাবাদের মুক্তিত্রাতা অবতার ভেবে নারী পুরূষ নির্বিশেষে তাদের ভর প্রার্থণা করাকে অনুমোদন করতে হয়। ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ মাধুলী, যাদু-ঠোঁনার চিকিৎসায় ফিরে যেতে হয়)। নাকি অতীতের সকল দেশাচারই আমরা পরিহার করব? (তাহলেতো আমাদের আত্ন-পরিচয়ের শেকড়টাই উপড়ে যায়।) উপরোক্ত প্রস্তাবনার কোনটাই সঠিক নয়। বস্তুতঃ এ বিতর্কের সমাধান করতে হলে সংস্কৃতির পরিবর্তনশীলতা আমাদের বুঝতে হবে। মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী। জীবনধারণ পদ্ধতির পরিবর্তনের সাথে তার চিন্তা পাল্টায়, রুচি পাল্টায়, পাল্টায় তার আচার-আচরণ। ফলতঃ তার সংস্কৃতি ও নিয়ত পরিবর্তনশীল। ধর্মীয় বিশ্বাস, শিক্ষা, বিজ্ঞান, বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাব প্রভৃতি সংস্কৃতির এ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। ফলতঃ মানুষ নিজের অজান্তেই তার আচরণে পরিবর্তন নিয়ে আসে। প্রণিধানযোগ্য ব্যাপার হলো, সস্কৃতির এ পরিবর্তন বা বিবর্তন সাধারণতঃ উর্দ্ধমুখী; অর্থাৎ উন্নতির দিকে তথা আধুনিকতার দিকে। সংগত কারনেই সংস্কৃতির এ উর্দ্ধমুখী বিবর্তন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিরোধী।

এখন প্রশ্নহলো, অগ্রসরমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগুতে হলে এ অনিবার্য সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আমাদের মেনে নেওয়া ছাড়া বিকল্প আছে কিনা? আরো মৌলিক প্রশ্ন সামনে এসে পড়ে, তাহলো ঐতিহ্য রক্ষার তাগিদে আমরা কি আমাদের সকল পশ্চাৎপদতা, দারিদ্র, কুসংস্কার, কূপমন্ডুকতা আকঁড়ে রাখব, নাকি প্রাগ্রসরমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাব? অগ্রসরমান প্রত্যেক জাতির জন্য প্রশ্নগুলো সমান ভাবে প্রযোজ্য। সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, মানুষ পছন্দ করুক বা না করুক তার সংস্কৃতি কখনো থমকে থাকেনি, পরিবর্তন বিবর্তনের মাধ্যমে তা এগিয়ে গেছে। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি আমাদের অনুধাবন করতে হবে, তাহলো সমগ্র বিশ্ব মানব গোষ্ঠী স্ব স্ব সাংস্কৃতিক ভিন্নতা নিয়েই একটি সাধারণ সংস্কৃতির(Common culture) দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী একটি সাধারণ মানবসংস্কৃতি সৃষ্টি হচ্ছে। এ সংস্কৃতি অবশ্যই আধুনিক, মানবতাবাদী ,সার্বজনীন সংস্কৃতি। (বিকাশের এটা মূল ধারা হলেও পাশাপাশি নানা বিকৃতিও বিদ্যমান)। এটাকে বিশ্বে বিদ্যমান সকল সংস্কৃতির উন্নত সংকর সংস্কৃতিও বলা চলে। (যেমন, যে কোন দেশের আধুনিক পুরুষ তার স্বকীয় সংস্কৃতি নির্বিশেষে স্যুট-প্যান্ট-টাই পরে, আধুনিক মেয়েরা পরে স্কার্ট বা প্যান্ট শার্ট। আহার বিহারে সারা দুনিয়ার মানুষ প্রায় একই আচরণ করে। গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সুশাসন, আইনের শাসন ইত্যাকার বিষয়গুলো আজ সারা দুনিয়ার মূল্যবোধ।) অতএব, আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, বৈদেশিক সংস্কৃতির সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সমন্বয়ের মাধ্যমে তার বিবর্তন ও বিকাশ ইতিহাস নির্ধারিত। আমাদের ভূমিকার উপর নির্ভর করবে কত দ্রুত আমাদের জাতি একটি বিকশিত-উন্নত আধুনিক সংস্কৃতির অধিকারী হবে । কিন্তু কেউ চাইলেও সংস্কৃতির এ উর্দ্ধমুখী বিকাশকে পেছনে টেনে নিতে পারবেনা। কারণ কালের চাকাকে কখনো পেছনে ঘুরানো যায়না।

আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতা

আমাদের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিদ্যমান পশ্চাৎপদতাকে আমরা নিম্মোক্ত ক্ষেত্রে চিহ্নিত করে আলোচনা করতে পারি।

ক) অশিক্ষা-কুশিক্ষাঃ- বেদনাদায়ক হলেও যে সত্যটি আমাদের অকপটে স্বীকার করতে হয়, তাহলো স্বাধীনতার সাড়ে তিন দশক পরেও শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা এখনো একটি পশ্চাৎপদ জাতি। নিছক অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা এখনো ৫০%এর কোটা পার হয়নি। তদুপরি রয়েছে শিক্ষার মানের প্রশ্নটি। আমাদের প্রচলিত শিক্ষার মান এখনো আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পর্যায়ে পৌছতে পারেনি। বস্তুতঃ দেশে একক কোন শিক্ষার ধারা এখনো গড়ে উঠেনি। স্কুল শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা, কিন্ডারগার্টেন, সাধারণ কলেজ, ক্যাডেট কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে সার্বজনীন কোন শিক্ষাক্রম গড়ে উঠেনি । এ সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শুধু পাঠ্যক্রমে পার্থক্য নয়, শিক্ষার পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনায় ও রয়েছে যথেষ্ট পার্থক্য। গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির কোন সাধারণ কর্তৃপক্ষ এক্ষেত্রে অনুপস্থিত। গ্রাম বাংলায় এখনো সেই "ইয়াদ আলী মাষ্টারের পাঠশালাই" প্রাথমিক শিক্ষার একমাত্র বাহন । গ্রামের সিংহ- ভাগ ছেলেমেয়ে এখনো প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডী অতিক্রম করতে পারেনা। গ্রাম্য জনগোষ্ঠীর চরম দারিদ্র্য তাদের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষার পথে চরম অন্তরায় হিসাবে এখনো বিরাজ করছে। তাই একদিকে যেমন শিক্ষার পরিমাণগত প্রবৃদ্ধি ঘটছেনা, অন্য দিকে গুণগত বিকাশ ও চরমভাবে বাধাঁগ্রস্থ হচ্ছে। শিক্ষার পরিবর্তে অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও কুসংস্কার এখনো দেশের সিংহভাগ গরীব জনগোষ্ঠীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। গ্রাম্য সমাজের যারা সর্দার মাতব্বর এবং শহুরে মধ্যসত্বভোগী এলিট শ্রেণী তাদের কায়েমী স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার জন্যে গ্রাম-শহরের গরীব জনগোষ্ঠীকে ধর্ম, প্রথা-পদ্ধতি বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নামে নানা কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস আকঁড়ে থাকতে এবং লালন করতে প্ররোচিত করছে। তাই আমাদের সংস্কৃতির সুষম বিকাশ বাঁধা গ্রস্থ হয়। ফলতঃ আমাদের সমাজের একটি ক্ষুদ্র শিক্ষিত জনগোষ্ঠী আধুনিক ধ্যান ধারনা ও মূল্যবোধে অভ্যস্থ হয়ে উঠলেও ব্যাপক জনগোষ্ঠী এখনো পুরানো ধ্যান-ধারনা ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী। ফলশ্রুতিতে সংস্কৃতির এ অন্তর্নিহিত অসমসত্ত্বতা (Hetrogeneity) সুনিবীড় জাতীয় ঐক্যের পথে অন্তরায় হয়ে রয়েছে।

খ) ধর্মান্ধ চিন্তা-চেতনা, কুসংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতা

আমাদের সংস্কৃতিতে ধর্মের প্রভাব নিয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। ধর্মের নামে কিংবা ধর্ম বিশ্বাসের আড়ালে আমাদের সমাজে বহু কুসংস্কার বিদ্যমান। এ কু-সংস্কার যেমন আমাদের পিছু টানছে--কোন ভাবেই এগুতে দিচ্ছেনা, তেমনি আমাদের এ পশ্চাৎপদতাই জাতিকে ঐ কুসংস্কার আকঁড়ে ধরে রাখতে সাহায্য করছে। এভাবে সমগ্র জাতি যেন এক দূর্লঙ্ঘ্য দুষ্টচক্রের (vicious circle) মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তাই বহু বদ্ধ পাগল এখনো আমাদের সমাজে অবতার রূপে পূজিত হয়ে আসছে। আধুনিক চিকিৎসার পাশাপাশি এখনো তাবিজ মাধূলি, পানি পড়া, ঝাঁড়-ফূক, ওজা-বদ্যের জ্বীন হাজির জাতীয় চিকিৎসা দোর্দন্ড প্রতাপে বিদ্যমান এবং এগুলো আমাদের লোকজ সংস্কৃতির অনুসঙ্গও বটে। তাছাড়া আমরা পুর্বেই আলোচনা করেছি যে, দুনিয়ার কোন ধর্মই তার শ্রেষ্ঠত্বের দাবী পরিহার করেনি। ফলতঃ সাধারন ধর্মপ্রবণ মানুষের অন্তরে স্বীয় ধর্ম নিয়ে একটি সুপ্ত অহংবোধ বিরাজ করে। তাকে সুকৌশলে প্রয়োজন মত উস্কে দিয়েই স্বার্থান্ধ রাজনীতিবিদ কিংবা ধর্মবেত্তারা সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। লোকজ সংস্কৃতির এ জাতীয় কুসংস্কার ও পশ্চাৎপদ ধ্যান-ধারনা থেকে সমাজকে মুক্ত করতে বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা বিস্তারের কোন বিকল্প নেই। এমনিই আমাদের শিক্ষিতের হার খুবই নগন্য। তদুপরি শিক্ষার নামে যা প্রচলিত তাকে যথার্থ শিক্ষা বলা চলে কিনা তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। শিক্ষার নামে আমাদের দেশে সরকারী ভাবেই কুসংস্কার আর গোঁড়ামী ছড়ানো হয়, তাকে লালন করতে উৎসাহিত করা হয়। নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে জাতীয় গৌরবময় ইতিহাসকে বিকৃতভাবে পড়ানো হয়। সমাজ ও রাষ্ট্র নায়কেরা আধুনিক প্রযুক্তির সকল সুফল তলানী শুদ্ধ গলাধঃকরণ করলেও সমাজের আম জনগোষ্ঠীর পশ্চাৎপদ জীবনযাত্রাকে পৃষ্ঠপোষকতা করে, কখনো রাজনৈতিক স্বার্থে, কখনো কায়েমী স্বার্থে। এ কঠিন, দূর্ভেদ্য অচলায়তন থেকে জাতিকে রক্ষা করতে হলে একটি শিকড়-নাড়া সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কোন বিকল্প নেই।

গ) চরম দারিদ্র্য

আমাদের সমাজের সিংহভাগ জনগোষ্ঠী এখনো চরম দারিদ্র্য সীমার নীচে জীবন যাপন করছে। এ দারিদ্র্য তাদের জীবন যাত্রাকে মানবেতর পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। দারিদ্র্য যেমন তাদের অশিক্ষার মূল কারন, আবার অশিক্ষা তাদের দারিদ্র্য বিমোচনের পথে প্রধান অন্ত রায়। এ দুষ্টচক্র (vicious circle)থেকে জাতিকে মুক্ত করতে যে সাংস্কৃতিক জাগরণ প্রয়োজন তার কোন প্রয়োজনীয়তা স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরে আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব অনুভব করেননি। তাই বেদনাদায়ক হলেও যে নির্মম সত্যটি আমাদের স্বীকার করতে হয় অকপটে, তা হলো একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েও দেশের সিংহভাগ মানুষ মৌলিক অধিকার বঞ্চিত পরাধীন জীবন যাপন করছে। স্বদেশে পরাধীন এ জনগোষ্ঠীকে মুক্তির স্বাদ দিতে হলে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে একটি মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে। এ পরিবর্তনের জন্য সামাজিক বিপ্লব সর্বাপেক্ষা কাঙ্খিত হলেও তার উপযোগী প্রস্তুতি এখনো অনুপস্থিত। সংস্কারই আপাতঃ বিকল্প।

কিভাবে সে সংস্কার সম্ভব?

স্বাধীনতার সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর পরেও আমাদের এ পশ্চাৎপদতার যত কারণই আমরা নির্ণয় করিনা কেন, এর মূল ও প্রধান কারন হলো আমাদের রাজনৈতিক ব্যর্থতা। স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের যে বিশাল অর্জন––জাতীয় একাত্নবোধ, দেশ ও জাতির জন্য জীবন উৎস্বর্গের প্রেরণা, অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ, শোষণ মুক্তির স্বপ্ন ইত্যাদি বিষয়গুলো আমরা ধারণ করে রাখতে পারিনি আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্বার্থলোলুপতা ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে। স্বাধীনতা-উত্তর দেশ গঠনে নেতৃত্বের ব্যর্থতার পাশাপাশি সততাও ছিল প্রশ্ন সাপেক্ষ। তাই স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে তিলে তিলে অঙ্কুরিত স্বপ্ন গুলো দ্রুত যেমন ভেঙ্গে যেতে লাগল, ঠিক তেমনি ক্ষয়ে যেতে লাগল অর্জিত মূল্যবোধগুলোও। কায়েমী স্বার্থের নগ্ন দ্বন্দ্বের সাথে ক্ষমতা নিয়ে কামড়া কামড়ি দেশে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির জন্ম দিল। পরিণতিতে রাজনীতি হোয়ে পড়ল কেবল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করার কৌশল, জনগণের কল্যাণের কোন চিন্তা এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সে ধারাবাহিকতায় আজকে দেশের রাজনীতি চরম ভ্রষ্টাচারে পরিণত হোয়েছে। ঋণখেলাফী কাল টাকার মালিক, দূর্নীতিপরায়ন সামরিক বেসামরিক আমলা, সমাজদ্রোহী সন্ত্রাসী এবং কতিপয় চরিত্রহীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতে রাজনীতি কুক্ষিগত হোয়ে পড়েছে। তাদের অবস্থান ও নিয়ন্ত্রণ যদি কেবল একটি বিশেষ দলে হতো, তাহলেও তাদের মোকাবেলা করা যেত সহজে। কিন্তু বাস্তবতা হলো বৃহৎ সব রাজনৈতিক দলগুলো সত্যিকার অর্থে আজ তাদেরই নিয়ন্ত্রণে। সর্বগ্রাসী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে গেছে এ মাফিয়া চক্র। জনগণের অর্থ আত্নসাৎ করে তারা বিপুল অর্থের মালিক হয়ে বসে আছে। বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো চলে তাদেরই অর্থে। তাই যারাই ক্ষমতায় যাক না কেন, তাদের কোন ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেনা। অর্থ দিয়ে তারা প্রশাসনকে বশে রাখে। ব্যাংক ঋণ আত্নসাৎ করে কিংবা চোরাকারবার করে কোটি টাকার মালিক হয়ে তারা বিচার ব্যবস্থার আওতার বাইরে চলে গেছে। আইনের হাত যতই লম্বা হউক, তাদের ছূঁতে পারেনা। মানুষ খুণ করেও তারা পার পেয়ে যায়। গণমাধ্যমের উপরও তাদের নিয়ন্ত্রণ অপ্রতিরোধ্য। অতএব––বলাবাহুল্য–– বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো দিয়ে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার কল্যাণমুখী কোন সংস্কার সম্ভব হবেনা। স্বাধীনতার পর হতে বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গিয়ে তারা তা ইতোমধ্যেই প্রমানিত করেছে। (তাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে-বিপক্ষে যে বিতর্ক তা অর্থহীন। বস্তুতঃ তারা কেউই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ আজ আর ধারণ করেনা। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি নিয়ে তাদের মধ্যে শুধু মাত্রাগত কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। এক পক্ষ অনেকটা জবরদস্তি করে তাদের দলীয় নেতাকে ইতিহাসের নায়ক বানাতে চায়––যা হাস্যস্পদ ব্যর্থ প্রয়াস–– অপর পক্ষ স্বাধীনতা যুদ্ধে জাতির বীরত্বগাঁথাকে পুরোটাই দলীয় কৃতিত্বে পরিণত করতে চায়।) অতএব প্রয়োজন বিকল্প শক্তির।

কি ভাবে বিকল্প শক্তির উত্থান সম্ভব

তত্ত্বগতভাবে বিকল্প শক্তির উত্থানের প্রয়োজনীয়তা যতই অনূভত হউক না কেন, বাস্তবে এ এক সুকঠিন কাজ।। সার্বিক পশ্চাৎপদতার অচলায়তনে জিম্মি আমজনগণ শারিরীক ভাবে আড়ষ্ট মানসিক প্রতিবন্ধীতে পরিণত হয়ে সব কিছু মেনে নেওয়ার নিস্পৃহতায় আক্রান্ত। তারা যেন ভাবতেই পারছেনা এ অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব। এহেন অবস্থায় বিকল্প শক্তি গড়ার প্রয়াস এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার বৈকি। এতদসত্বেও সৎ , মেধাবী ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের সমবেত করার উদ্যোগ নিতে হবে এ অচলায়তন ভাঙ্গতে প্রত্যাশী রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও দেশ প্রেমিক নাগরিক সমাজের। অতঃপর সাধারণ মানুষের সামনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে--

ক) চলমান রাজনীতি ও বিদ্যমান বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর অসারতা ও গণবিমুখীতা,

খ) পরিবর্তনের যুক্তি সঙ্গত ও সহজবোধ্য রূপরেখা, (মনে রাখতে হবে পরিবর্তনের রূপরেখা, পরিবর্তনের শক্তি গড়ে তোলার অনিবার্য পূর্ব শর্ত।)

অতঃপর নোতুন রাজনৈতিক লক্ষ্য সামনে রেখে তাদের সংগঠিত করতে হবে। এ প্রয়াস চালাতে হবে নিরলস ও নিরবচ্ছিন্নভাবে। এভাবে জনগণকে ক্রমান্বয়ে সম্পৃক্ত করেই বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির উম্মেষ ঘটানো যাবে। এর কোন সংক্ষিপ্ত বিকল্প নেই এবং যত কঠিনই হউক এ কাজ কাউকে না কাউকে করতেই হবে।

** মোহাম্মদ জানে আলম*
গবেষণা, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান বিষয়ক সম্পাদক,
গণফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটি।